

সূরা আন নাজ্‌ম-৫৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় আলেমের এই অভিমত যে এই সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে মুসলমানদের আবিসিনিয়াতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে মুসলমানেরা আবিসিনিয়াতে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে বাইবেলে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রাকৃতিক ঘটনা পরস্পরের ভিত্তিতে কুরআনের ঐশী-বাণী হওয়ার সত্যতা এবং মহানবী (সাঃ) এর প্রেরিতত্বের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সূরাটিতেও একই বিষয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে বিবৃত হয়েছে। মহানবী (সাঃ)কে শ্রেষ্ঠতম রসূল বলে বর্ণনা করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানুষের জন্য শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষা সহকারে এই মহানবী আল্লাহ্র তরফ থেকে আগমন করেছেন।

বিষয়বস্তু

সূরার প্রারম্ভে মহানবী(সাঃ) এর নবুওয়াতের দাবীর সমর্থনে ‘আননা জমের পতন’কে সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐশী রহস্যাবলীতে অভিযুক্ত মহানবী (সাঃ) ঐশী অনুগ্রহরাজি ও জ্ঞান এবং ঐশী সত্তার নিগূঢ় পরিচিতির ভান্ডার থেকে আকর্ষণ সুধা পান করে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন কল্পনাতে উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, যাতে উঠা অন্য মানবের জন্য সম্ভব নয়। তিনি মানবের জন্য প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও সহানুভূতিতে মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ হয়ে এমন এক জগতের কাছে তওহীদের বাণী প্রচারের কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেন, যারা হস্তনির্মিত কাঠের ও পাথরের পুতুলের পূজায় আপাদমস্তক নিমগ্ন ছিল। অতঃপর এই সূরা মানব জীবনের অকিঞ্চিৎকর প্রারম্ভকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে মানবেতিহাস ও মানব-বিবেক থেকে আল্লাহ তাআলার একত্বের স্বপক্ষে ও পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদনে অতি শক্তিশালী, অটল ও অলংঘ্য যুক্তিমালার অবতারণা করেছে। এই নির্বোধ আচার-অনুষ্ঠান (প্রতিমা পূজা) ইত্যাদি প্রকৃত জ্ঞানের অভাব থেকে সৃষ্ট এবং এর যৌক্তিকতা এমন ভিত্তিহীন অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যা সত্যের মোকাবিলায় কোনই মূল্য রাখে না। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, পুতুল-পুজারীদের উচিত ছিল, ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীগণের জীবন-বৃত্তান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাদের সমসাময়িক ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে পৌত্তলিকতার বিশ্বাস ও আচার-আচরণ পৌত্তলিকদেরকে সব সময়েই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় বোঝা বইতে এবং নিজের কৃত-কর্মের জন্য আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে আর সকলের শেষ গন্তব্যস্থল ঐ একই আল্লাহ্। সূরার শেষদিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে ঐশী-বাণীকে যদি তারা ক্রমাগতভাবে প্রত্যাখ্যান করে চলে তাহলে তারাও নূহ (আঃ) এর জাতির মত, আদ ও সামুদ জাতির মতই দুর্ভাগ্যের কবলে নিপতিত হবে। কেননা এটা একেবারে অবধারিত যে মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এর ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না।



সূরা আনু নাজ্‌ম-৫৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকু

১। ১. আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। তারকার কসম^{২৮৬৮} যখন তা পতিত হবে।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ②

৩। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয়নি এবং ব্যর্থও হয়নি^{২৮৬৯}

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ③

৪। এবং সে প্রবৃত্তির বশে কথা বলে না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ④

৫। এ তো কেবল এক ওহী, যা অবতীর্ণ করা হচ্ছে^{২৮৭০}।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ⑤

৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ) তাকে (এ বাণী) শিখিয়েছেন^{২৮৭১},

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑥

দেখুন : ক.

২৮৬৮। ‘আনুনায্‌ম’ অর্থ তারকা, কাণ্ডবিহীন গাছ। তবে নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় ‘সপ্তর্ষিমণ্ডল’। অনেক তফসীরকারকের মতে কুরআনের খণ্ড খণ্ড অবতরণকে ‘আনুনায্‌ম’ বলা হয়েছে। আবার বহু বিজ্ঞ আলোচকের অভিমত, ‘আনুনায্‌ম’ দ্বারা হয়রত নবী করীম (সাঃ) কেই বুঝিয়েছে। এই শব্দের বহুবচন ‘আনুনায্‌ম’ দ্বারা জন-নেতাগণকেও বুঝায়, ক্ষুদ্র রাজ্যকে বা ক্ষুদ্র স্বাধীন এলাকাকেও বুঝায় (কাশাফ, তাজ, গারায়েবুল কুরআন)। এই শব্দের বিভিন্ন অর্থকে সামনে রেখে এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হতে পারেঃ-(১) মহানবী (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের মর্ম হলো, যখন পৃথিবীর সর্বত্র আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে, ইসলামের নাম ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না এবং অক্ষরগুলো ছাড়া কুরআনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, ঈমান আকাশে উঠে যাবে, তখন পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি একে পৃথিবীতে পুনরায় নামিয়ে আনবেন- (বুখারী কিতাবুত তফসীর, সূরা তুল জুমুআ)। (২) কুরআনের ঐশী-বাণী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআনই বহন করবে। (৩) ইসলামের এই সুকোমল চারাগাছটি প্রবল বিরোধিতার ঝড়-ঝঞ্ঝায় উৎপাটিত হয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে হলেও অতি সত্তর তা বিরাট মহীকূহে পরিণত হবে, যার ছায়াতলে পৃথিবীর জাতিসমূহ এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে। (৪) আরবরা যেমন বিশাল মরুভূমিতে ভ্রমণকালে আকাশের তারকার সাহায্যে নিজেদের পথ ও দিক ঠিক রেখে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয় (১৬ঃ১৭) ঠিক তেমনিভাবে এই উজ্জ্বল তারকা (মহানবী সাঃ) এর অনুসরণে তারা এখন আধ্যাত্মিক গন্তব্য পথে অগ্রসর হতে থাকবে। (৫) এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে আরব দেশে বর্তমানে প্রচলিত যে জরাজীর্ণ শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে তা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে (৫৪ঃ২)।

২৮৬৯। যে সকল আদর্শ ও নীতিমালা মহানবী (সাঃ) স্থাপন করেছেন, সেগুলো মোটেই ভ্রান্তিপূর্ণ নয়। তিনি ভুল করেননি এবং এসব আদর্শ ও নীতিমালা থেকে তিনি সামান্যও বিচ্যুত হননি (তিনি পথ-দ্রষ্ট হননি)। অতএব আদর্শ ও নীতিমালার দিক থেকে কিংবা সেই আদর্শ নীতিমালাকে জীবনে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের উভয় দিক থেকেই তিনি নিশ্চিত ও নিরাপদ পথ-প্রদর্শক। এ যুক্তিগুলোকে পরবর্তী আয়াতসমূহে আরো জোরালো করা হয়েছে।

২৮৭০। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর ওহী-ইলহামকে আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ বাণী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২৮৭১। কুরআনের বাণী এতই শক্তিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী যে এর উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বাণীগুলো দীপ্তিহীন ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে।

★ ৭। (যিনি) মহাশক্তির অধিকারী^{২৮৭২}। এরপর তিনি (তাঁর আরশে) অধিষ্ঠিত হলেন^{২৮৭৩}।

ذُوْمِرَّةٌ فَاسْتَوَىٰ ۝

★ ৮। আর তিনি যখন ^কসর্বোচ্চ দিগন্তে^{২৮৭৪} ছিলেন (তখন তিনি তাঁর বাণী অবতীর্ণ করলেন)।

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

৯। এরপর সে (আল্লাহর) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও [মুহাম্মদ (সা:) এর দিকে] নিচে নেমে এলেন^{২৮৭৫}।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝

১০। এরপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা এর চেয়েও^{২৮৭৬} নিকটবর্তী (হয়ে গেল)।

كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝

দেখুন : ক. ৮১ঃ২৪

২৮৭২। ‘মেররা’ অর্থ শক্তি, বুদ্ধি-মত্তা, সূক্ষ্মতম বিচারক্ষমতা, দৃঢ়তা (আকরাব)। ‘যু মেররা’ অর্থ যার প্রতাপ ও ক্ষমতা চিরকাল প্রকাশ পেতে থাকবে।

২৮৭৩। ‘ইসতাওয়া আলা শাইয়ে’ মানে যে কোন বস্তুর উপরে পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করলো বা পুরোপুরি কর্তৃত্ব অর্জন করলো। বাক্যটি যদি মহানবী (সাঃ) এর উপর আরোপিত হয় তাহলে এর অর্থ হবে, মহানবী (সাঃ) এর বল-বিক্রম, বুদ্ধি-মত্তা ও মানসিক শক্তিনিচয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছে।

২৮৭৪। আল্লাহ তাআলা যখন স্বীয় সত্তা ও পূর্ণতম মহিমায় মহানবী (সাঃ) এর কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি (সাঃ) তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম স্তরে উন্নীত হলেন। এই আয়তের এই অর্থটি রয়েছে বলে মনে হয় যে ইসলামের জ্যোতির্ময় আলো এত উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে তা সারা বিশ্বে আলোকিত করতে পারবে। ‘হুয়া’ তিনি সর্বনামটি আল্লাহকেও বুঝাতে পারে, মহানবী (সাঃ)কেও বুঝাতে পারে। ১০নং আয়াত দেখুন।

২৮৭৫। ‘দাল্লা দালওয়া’ অর্থ সে বালতিটি কূপের তলদেশে নামালো, সে বালতিটি কূপের মধ্য থেকে উপরে উঠালো। ‘তাদাল্লা’ অর্থ সে নীচে নামালো বা নামালো, সে নিকটে এল বা অধিক নিকটবর্তী হলো (লেইন, লিসান)। আয়াতটির অর্থ দাঁড়াচ্ছেঃ হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হলেন এবং আল্লাহ তাআলাও তাঁর দিকে ঝুঁকে নিকটবর্তী হলেন। আয়াতটিতে এই অর্থও নিহিত আছে যে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ তাআলার চরম নৈকট্য লাভ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফল্গু ধারায় আকর্ষণ পান করলেন এবং তা মানব জাতিকে বিলিয়ে দিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হলেন।

২৮৭৬। ‘কাব’ ধনুকের ঐ অংশটিকে বলা হয় যা হাত দিয়ে ধরবার স্থান থেকে বাঁকানো প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, ধনুকের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, পরিমাপ বা স্থান। আরবরা বলেন, ‘বাইনাহুমা কাবা কাওসাইনে’ বা ‘তাদের উভয়ের মধ্যে ধনুকের পরিমাপ রয়েছে অর্থাৎ দুই জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আরবী ভাষায় আছে ‘রামাওনা আন কাউসিন, ওয়াহিদিন’, যার শাব্দিক অর্থ, ‘তারা একই ধনুক থেকে আমাদের প্রতি তীর ছুঁড়লো, অর্থাৎ তারা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বা একমত হলো। এইরূপে শব্দটি ‘ঐকমত’কে বুঝায় (লেইন; লিসান, যমখশরী)। ‘কাব’ শব্দের তাৎপর্য যাই হোক না কেন, ‘কাবা কাওসাইনে’ দ্বারা দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় ঐক্যের সম্পর্ককে বুঝায়। এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চতম গন্তব্যের দিকে উর্ধ্বস্তর থেকে উর্ধ্বতর স্তর ক্রমাগত অতিক্রম করতে করতে আল্লাহর এতই নিকটে পৌঁছে গেলেন যে উভয়ের মাঝে আর কোন দূরত্ব রইলো না, মহানবী (সাঃ) যেন দুটি ধনুকের একই তন্ত্রী বা রজ্জুতে পরিণত হয়ে গেলেন। ‘দুই ধনুকের একতন্ত্রী- একটি আরবী প্রবাদ, যা আরবদের পুরাতন রীতি থেকে উদ্ভূত। দুই ব্যক্তি যখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো তখন পুরাতন আরব-রীতি অনুযায়ী তাদের দুই জনের ধনুককে একত্রে এমনভাবে বাঁধতো যে দুটি ধনুক মিলে একটি ধনুকের মতই দেখায়। অতঃপর এই সম্মিলিত ধনুক থেকে দুজনে একটি মাত্র তীরকে সম্মিলিত হস্তে ছুঁড়তো। এর দ্বারা তারা বুঝাতো যে ঐ মুহূর্ত থেকে তারা (যেন) একীভূত হয়ে গেছে, তাদের একের উপর আক্রমণকে অপর জনের উপরে আক্রমণ বলে গণ্য হবে। যদি ‘তাদাল্লা’ ক্রিয়া শব্দটি আল্লাহ তাআলার দিকে আরোপ করা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবেঃ মহানবী (সাঃ) আল্লাহ তাআলার দিকে উর্ধ্বে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলাও মহানবী (সাঃ) এর দিকে নিম্নে এলেন। এ ছাড়া তারা উভয়ে মিলিত হয়ে যেন এক হয়ে গেলেন। এ ছাড়া এই আয়াতটিতে অন্য একটি সুন্দর-সূক্ষ্ম কথাও রয়েছে। তা হলো মহানবী (সাঃ) আল্লাহ তাআলার মধ্যে নিজেই এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং যেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি হয়ে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১। এরপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সেই ওহী করলেন, যা ওহী (করার সিদ্ধান্ত তিনি) করেছিলেন^{২৮৭৭}।

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝

★ ১২। (মুহাম্মদ-সা:) এর হৃদয় সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি^{২৮৭৮} যা সে দেখেছিল।

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝

১৩। এরপরও কি তোমরা তার সাথে সে সম্পর্কে বিতর্ক করছ যা সে দেখেছে?

أَفْتُمِرُّونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝

১৪। আর সে তাঁকে অন্য এক অবস্থাতেও দেখেছে^{২৮৭৯},

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝

১৫। শেষ সীমায় অবস্থিত কুল গাছের নিকটে^{২৮৮০}।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝

গিয়েছিলেন। অপরদিকে তিনি প্রেমভরা হৃদয়বেগ ও সহানুভূতিপূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে মানবের কাছে এমনভাবে অবতরণ করলেন যে তাঁর সত্তার উলুহিয়াৎ ও ইনসানিয়াৎ (ঈশ্বরত্ব ও ‘মানবত্ব’) একত্ব হয়ে গেল এবং তিনি উলুহিয়াৎ ও ইনসানিয়াতের মিলিত তত্ত্বীর কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হলেন। ‘আও আদনা’- ‘আরো অধিক নিকটবর্তী’ শব্দগুলো দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহ তাআলা ও মহানবী (সাঃ) এর মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা ও নিবিড় অন্তরঙ্গতা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত।

৮ থেকে ১৮ নং আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক উর্ধ্ব-ভ্রমণ বা মে’রাজের বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি আধ্যাত্মিকতার মহাকাশগুলোকে অতিক্রম করে আল্লাহ তাআলার সমীপে নীত হলেন এবং আল্লাহর গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশ সমূহের দর্শন লাভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি দ্বিমুখী অভিজ্ঞতা। একদিকে মহানবী (সাঃ) এর আল্লাহর দিকে আধ্যাত্মিক উর্ধ্ব-ভ্রমণ এবং অপরদিকে তাঁর দিকে আল্লাহ তাআলার জ্যোতির্মালার অবতরণ। ‘মে’রাজকে (আধ্যাত্মিক মহা উর্ধ্ব-ভ্রমণকে) সাধারণ মানুষ ‘ইসরা’র (মহানবী সাঃ এর রাত্রিযোগে জেরুসালেমে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে। আসলে এই দুটি পৃথক পৃথক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। ‘ইসরা’ ঘটেছিল নবুওয়াতের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরে আর ‘মে’রাজের ঘটনা ঘটেছিল এর ছয়-সাত বৎসর পূর্বে মুসলমানদের আবিসিনিয়াতে প্রথম আশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল পরে। এই দুটি ঘটনার যে সব বিশদ বর্ণনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে রয়েছে সেগুলোকে সতর্কতার সাথে পাঠ করলে এই অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এই দুটি ঘটনার কিছুটা আলোচনা ১৫৯০ টীকায় দেখুন।

২৮৭৭। ‘মা’ কখনো কখনো সম্মান, আশ্চর্য কিংবা জোরালোভাবে প্রকাশ এই তিনটির কোন একটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (আকরাব)। এখানে আশ্চর্যবোধে অভিযুক্ত হয়েছে এইভাবে- আল্লাহ তাঁর বান্দা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ওহী করলেন, আর তা ছিল এক চমৎকার মহিমামণ্ডিত ওহী!

২৮৭৮। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, মহানবী (সাঃ) এর হৃদয় যা দেখেছে তা-ই তিনি ব্যক্ত করেছেন। এ ছিল প্রকৃতই সত্য। এ ছিল নিশ্চিত সত্য অভিজ্ঞতা। এতে কল্পনার লেশমাত্র মিশ্রণ ছিল না।

২৮৭৯। মহানবী (সাঃ) এর এই কাশ্ফ বা দিব্য-দর্শন ছিল একটি যুগল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।

২৮৮০। মহানবী (সাঃ) মে’রাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার এতই সান্নিধ্যে পৌঁছিলেন যে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্ব-তথ্য এবং সত্যের এক অফুরন্ত অতল সীমাহীন সমুদ্র তার কাছে উপস্থাপন করা হলো। ‘সাদির’ শব্দটি, যার অর্থ সমুদ্র, তা একই মূল-ধাতু থেকে উৎপন্ন যা থেকে ‘সিদরাত’ শব্দ উৎপন্ন হয়েছে (লেইন)। আয়াতটি এই কথাও রূপকাকারে বুঝাতে পারে যে কুলগাছের মত মহানবী (সাঃ) এর ঐশী লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষামালা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদের শান্ত-ক্লান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবল-সুস্থ রাখবে। কুলগাছের পাতা মৃতদেহকে যেমন পচন থেকে রক্ষা করে, তেমনি মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র ঐশী শিক্ষা শুধু আপন পবিত্রতাই রক্ষা করবে না, বরং বিশ্ব মানবকেও পচন ও অপবিত্র হওয়া থেকেও রক্ষা করবে। এমনও হতে পারে, হৃদয়বিয়ার সন্ধির পূর্বে মহানবী (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে সাহাবীগণ একটি বৃক্ষের ছায়াতলে তাঁর প্রতি প্রাণান্ত আনুগত্যের অনন্য সাধারণ শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই শপথের সাথে সাথে এই বৃক্ষ ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবেও। এই আয়াতের বৃক্ষটি বিষয়দ্বাণীর আকারে হৃদয়বিয়ার ঐ বৃক্ষটিকেও নির্দেশ করতে পারে।

১৬। এর নিকটেই রয়েছে আশ্রয়দানকারী জান্নাত।

عِنْدَهَا جَنَّةُ النَّارِ ۝

১৭। (সে এটিকে অন্য অবস্থায় তখন দেখেছিল) যখন কুল গাছটিকে তা ঢেকে ফেলেছিল, যা (অর্থাৎ ঐশী জ্যোতি) সে সময় ঢেকে ফেলে^{২৮৮১}।

إِذْ يَغْشَى السَّيْدَةَ مَا يَفْشَى ۝

১৮। তার দৃষ্টিবিভ্রমও হয়নি এবং (দৃষ্টি) সীমাও ছাড়ায়নি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۝

১৯। নিশ্চয় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর মাঝে সবচেয়ে বড় নিদর্শন দেখেছিল।

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝

২০। তোমরাও ‘লাত’ ও ‘উয্যা’র কথা বল তো দেখি (এদের মহিমাও কি এরূপ)?

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝

২১। আর এ (গুলো) ছাড়া ‘মানাত’ (নামের) যে তৃতীয় প্রতিমা রয়েছে (এর মহিমাও কি এরূপ)^{২৮৮২}?

وَمَنْوَةُ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَىٰ ۝

দেখুন : ক.

২৮৮১। ‘যা ঢেকে ফেলে’ শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার জ্যোতির্বিকাশকে বুঝাচ্ছে।

২৮৮২। কতিপয় বিদ্বৈষপরায়েণ সমালোচক এই উদ্ভট গল্প সৃষ্টি করেছে, মহানবী (সাঃ) অন্তত একবার শয়তানের কবলে পড়েছিলেন। তারা বলে, মক্কাতে মহানবী (সাঃ) একদিন মু‘মিন ও কাফিরের একটি সম্মিলিত ক্ষুদ্র সমাবেশে এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতগুলো পর্যন্ত পাঠ করলেন তখন শয়তান চালাকি করে তাঁর মুখ থেকে নিম্নলিখিত বাক্যটি পাঠ করিয়ে নিল, “তিলকাল গারানিকাল উলা ওয়া ইন্না শাফায়াতাহুন্না লাতুরতাজা” অর্থাৎ এই দেবতাগুলো খুবই উচ্চস্তরের এবং এদের ‘শাফায়াত’ (সুপারিশ) সকলেই আশা করে (যুরকানী)। এই বানোয়াট গল্পটিই তাদের কাছে ‘মুহাম্মদের বিচ্যুতি বা পৌত্তলিকতার সাথে সন্ধি’ বলে খ্যাত। তারা এই ভিত্তিহীন গল্পটি পেয়েছে ‘ওয়াকিদী’ নামক একজন অতি মিথ্যুক হাদীস তৈরীকারকের কাছ থেকে অথবা তাবারীর বর্ণনা থেকে, যিনি যা শুনতেন তাই নির্বিচারে লিপিবদ্ধ করতেন এবং যাচাই না করে সকলের কথাই বিশ্বাস করতেন। এই বিদ্বৈষী সমালোচকেরা এমন এক মহামানবের উপর এই ঘৃণ্য বক্তব্য আরোপ করতে ঔদ্ধত্য দেখালো যাঁর সারাটা জীবনই পৌত্তলিকতার অসারতা-প্রমাণে ও তার নিন্দাবাদে অতিবাহিত হয়েছিল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামই ছিল তাঁর ব্রত। এই পবিত্র ব্রত পালনে তিনি ভীতিহীন নিষ্ঠা, বিরতিহীন উদ্দীপনা, আপোষহীন মনোভঙ্গী ও অতুলনীয় সংকল্প দেখিয়েছেন। শত তোষামোদ, শত লোভ-প্রদর্শন, বশীকরণের শত চেষ্টা, সর্বোপরি হত্যার ভীতি, এ সবকিছুই তিনি তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি তাঁর এই পবিত্র মহাব্রত থেকে তিনি এক ইঞ্চিও সরেননি। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়চিত্ততার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন (১৮ঃ৭, ৬৮ঃ১০)। পূর্বাপর সমগ্র প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, এই গল্পটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কেবলমাত্র পরবর্তী কয়েকটি আয়াতই নয়, বরং সমগ্র সূরাটিই পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সূরাটির এত সুস্পষ্ট বক্তব্যও মহানবী (সাঃ) এর ছিদ্রাশ্বেষী সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি! ইতিহাসের একটি পাতাও মহানবী (সাঃ) এর তথাকথিত বিচ্যুতির সমর্থন করে না। এই কল্পিত কাহিনীকে কুরআনের সকল তফসীরকারকই ‘মিথ্যা-গল্প’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে কাসীর ও ইমাম রাযী। মুসলিম চিন্তাবিদগণের মধ্যে বিজ্ঞান-মনা হাদীস-বেত্তাগণ যথা ‘আইনী’, ‘কাজী আইয়ায’ ও ‘নওয়াযী’- সকলেই এই গল্পকে ‘কল্পনার আবিষ্কার’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলনের (সিহাহ্ সেত্তাহ্) কোথাও এই গল্পটির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত হাদীস সংকলক ইমাম বুখারী (রাঃ), যিনি এই গল্পের সৃষ্টিকারী ওয়াকিদীর সমসাময়িক ছিলেন, তিনিও তাঁর ‘সহীহ্ বুখারীতে’ এই গল্পের বা কাহিনীর উল্লেখ করেননি। কাস্তালানী এবং যুরকানী অন্যান্য কয়েকজন সুযোগ্য আলোমের সহযোগিতায় বর্ণনা করেছেন যে মহানবী (সাঃ) সম্মিলিত সভায় যখন এ সূরাটি তেলাওয়াতের সময়ে এই আয়াতগুলোতে এলেন তখন দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত কোন অবিশ্বাসী পৌত্তলিক উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চস্বরে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। তখন কুরআন তেলাওয়াতের সময় সংশয় সৃষ্টির

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২২। তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাঁর জন্য কি কন্যা সন্তান?

اَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۝

২৩। তাহলে এতো এক অত্যন্ত অসংগত বন্টন।

تِلْكَ اِذَا قَسَمَةٌ فُضِرَتْ ۝

২৪। *এগুলো তো কেবল নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা এদের দিয়ে রেখেছ। এদের সমর্থনে আল্লাহ কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা শুধু কল্পনার^{২৮০} এবং যা তাদের প্রবৃত্তি চায় এরই অনুসরণ করে। অথচ নিশ্চয় তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে সঠিক পথনির্দেশনা এসে গেছে।

اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَنَتْنُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا
الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى اِلَآ نَفْسٌ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ
رَّبِّهِمْ الْهُدٰى ۝

★ ২৫। মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে এর সবটাই কি সে পায়?

اَمْرٌ لِّلْاِنْسَانِ مَا كَنَتْ ۝

★ ২৬। (বরং সব কিছু) অবসান এবং (সবকিছুর) সূচনা^{২৮১} আল্লাহরই হাতে।

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰى ۝

২৭। আর আকাশসমূহে কতই ফিরিশ্তা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোন কাজে আসে না। তবে আল্লাহ যাকে (সুপারিশ করার) অনুমতি দেন এবং (যার প্রতি) তিনি সন্তুষ্ট^{২৮২} তার কথা ভিন্ন।

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تَعْنٰى شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ
يَرْضٰهُ ۝

২৮। যারা পরকালে ঈমান আনে না নিশ্চয় তারাই স্ত্রীলোকের নামে ফিরিশ্তাদের নামকরণ করে,

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيَسْتُوْنَ الْمَلَائِكَةَ
تَسْوِيَةً الْاُنْثٰى ۝

২৯। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করছে। আর নিশ্চয় সত্যের বিপক্ষে^{২৮৩} অনুমান কোন কাজেই আসে না।

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ
اِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنٰى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

দেখুন : ক. ৬ঃ১০১, ৪৩ঃ১৭, ৫২ঃ৪০ খ. ৭ঃ৭২, ১ঃ৪১ গ. ৬ঃ১১৭, ১০ঃ৩৭।

জন্য এইভাবে বাধা প্রদানপূর্বক নিজের কথা সংযোজন করাটা ছিল কাফিরদের উপহাসের একটা অঙ্গ। এটা ছিল, বলতে কি, তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। ইতিহাস ঘেঁটে প্রমাণ মিলেছে যে জাহেলিয়তের যুগে কুরাইশরা যখন কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতো তখন তারা উপরোক্ত পৌত্তলিক শব্দগুলো উচ্চারণ করতো (মু'জামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড 'উজ্জা' শীর্ষক অধ্যায়)। এও বলা হয়ে থাকে যে উপর্যুক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা হজ্জের ৫৩নং আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথার অসারতা এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে যখন আমরা দেখি, সূরা নাজম অবতীর্ণ হয়েছিল নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে আর সূরা হজ্জ অবতীর্ণ হয়েছিল নবুওয়াতের দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বৎসরে। আরও দেখুন ১৯৬২ টীকা।

২৮৮৩। মু'মিন ব্যক্তি সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রস্তরের মত দৃঢ়তা নিয়ে আপন বিশ্বাসে দণ্ডায়মান থাকে (১২ঃ১০৯)। কিন্তু কাফির পৌত্তলিকের বিশ্বাস ও নিয়মাচারের স্বপেক্ষ না আছে কোন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি, না আছে কোন ঐশী অনুমোদন। সে আপন খেয়াল ও অনুমানের দাস হয়ে পড়ে। কুসংস্কার ও বংশানুক্রমিকতাই তার বিশ্বাসের ভিত্তি। এই আয়াত এবং ২৯ আয়াত পৌত্তলিকদের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থানের কথাই ব্যক্ত করেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে ভাসা ডালে দাঁড়িয়ে আছে।

২৮৮৪। মূল অনুবাদে যা লিখা হয়েছে, তা ছাড়া এ অর্থও প্রযোজ্য- ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে আল্লাহর ইচ্ছার অনুসরণ করে চলে এবং যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।

৩০। সুতরাং যারা আমাদেরকে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই চায় না, তুমিও তাদের উপেক্ষা কর।

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هَٰ عَنَّا وَلَمْ يُدِرِ الْأَ حَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

★ ৩১। এ হলো তাদের বিদ্যার দৌড়। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাকে ভাল করেই জানেন, যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাকেও ভাল করেই জানেন, যে হেদায়াত পেয়েছে।

ذٰلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝

৩২। আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহরই। এর ফলে যারা মন্দ কাজ করে তাদের কর্ম অনুযায়ী তিনি তাদের প্রতিফল দেন এবং যারা উত্তম কাজ করে তাদের তিনি সর্বোত্তম পুরস্কার দেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنِ ۝

★ ৩৩। ছোটখাট ভুলত্রুটি^{২৮৫} ছাড়া যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীলতা পরিহার করে (তাদের ক্ষেত্রে) নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল। "তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করার পর থেকে এবং তোমরা যখন তোমাদের মায়ের গর্ভে কেবলমাত্র ক্রণ আকারে ছিলে (তখন থেকেই) তিনি তোমাদের ভালভাবে জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবী করো না। কে মুত্তাকী তিনিই তা সবচেয়ে ভালো জানেন।

الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوٰحِشِ اِلَّا اللّٰمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاَسِعُ الْغَفْرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجْنَةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اَتَقٰى ۝

৩৪। তুমি কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যে (হেদায়াত থেকে) সরে গেছে

اَقْرَبَيْتَ الَّذِى تَوَلٰى ۝

৩৫। এবং সামান্য কিছু দান করেই হাত গুটিয়ে নিয়েছে^{২৮৬}?

وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ۝

৩৬। তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যাতে করে সে প্রকৃত (অবস্থা) দেখতে পায়?

اِعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوٰىرُهُ ۝

দেখুন ৪ ক. ১৬ঃ১২৬, ২৮ঃ৫৭, ৬৮ঃ৮ খ. ৪৪ঃ৩২, ৪২ঃ৩৮ গ. ১৩ঃ৮।

২৮৮৫। 'লামাম' অর্থ ঘটনা চক্রে, হঠাৎ খারাপ কাজে অগ্রসর হওয়া, ক্ষণস্থায়ী ও ভ্রান্তি, একটি চলন্ত মন্দভাব যা মনের মধ্যে উদয় হয়, কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যায়, স্ত্রীলোকের দিকে হঠাৎ ইচ্ছাহীন দৃষ্টিপাত, এর শব্দ-মূলটির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, তুরিৎগতি, বহু-ব্যবধানে ঘটা ও অনিচ্ছায়-ঘটা ইত্যাদি ভাব বিদ্যমান(লেইন)।

২৮৮৬। 'আক্দ্দা' যখন কোন ব্যক্তির ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় সে কৃপণতার সাথে দান করেছিল বা অনিচ্ছায় দান করেছিল, সে যা চেয়েছিল তা পায়নি। যখন এই শব্দটি খনি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন 'খনিটি কোন হীরক বা জহরত বের করলো না' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি খননকারীর সম্বন্ধে যখন ব্যবহৃত হয় তখন এই কথা বুঝায় যে খননকারী খনন করতে করতে শক্ত পাথরের নাগাল পেল, অতঃপর আর খনন করতে পারলো না (আকরাব)।

৩৭। অথবা তাকে কি সে সংবাদ দেয়া হয়নি যা মূসার ঐশী
পুস্তকসমূহে রয়েছে

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى

৩৮। এবং অঙ্গীকার পূর্ণকারী ইব্রাহীমের (পুস্তকসমূহেও যা
রয়েছে)?

وَالْإِسْمَ الَّذِي وَفَّى

৩৯। (আর তা হলো,) *কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা
বহন করবে না^{২৮৮৭}

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

★ ৪০। এবং মানুষের জন্য তার চেষ্টাপ্রচেষ্টার (ফল) ছাড়া আর
কিছুই^{২৮৮৮} নেই,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

★ ৪১। আর এ ছাড়া তার প্রচেষ্টাও শীঘ্রই স্বীকৃত হবে,

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

৪২। এরপর তাকে (এর) পুরোপুরি পুরস্কার দেয়া হবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

৪৩। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের^{২৮৮৯} দিকেই অবশেষে
(সবকিছুকেই ফিরে) যেতে হবে।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

৪৪। আর তিনিই হাসান ও কাঁদান

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

৪৫। এবং *তিনিই মৃত্যু দেন এবং জীবিতও করেন।

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

৪৬। আর তিনিই জোড়া *সৃষ্টি করেন অর্থাৎ নর ও নারী

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

৪৭। বীর্য থেকে, যখন তা (জরায়ুতে) ফেলা হয়।

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُنْحَى

৪৮। আর এ ছাড়াও পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো তাঁর
দায়িত্ব।

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى

দেখুন : ক. ৬ঃ১৬৫, ১৭ঃ১৬, ৩৫ঃ১৯, ৩৯ঃ৮ খ. ২ঃ২৯, ৩০ঃ৪১ গ. ৪ঃ২, ৭ঃ১৯০, ৩০ঃ২২ ঘ. ৫৬ঃ৫৯-৬০, ৭৫ঃ৩৮, ৮৬ঃ৭

২৮৮৭। নিজের পতাকা প্রত্যেককে নিজেই বহন করতে হবে, নিজের বোঝা অন্যে বইবে না।

২৮৮৮। পূত-পবিত্র নীতিমালা ও পুণ্যময় আদর্শ সহকারে যারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অক্লান্ত ও অবিরাম চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কেবল তাদের অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই আয়াতের অপর অর্থ হলো, প্রত্যেকেরই আপন পরিশ্রমের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত।

২৮৮৯। কার্য-কারণের সারাটা শৃঙ্খল আল্লাহুতে গিয়ে সমাপ্ত হয়। তিনিই সকল কারণের আদি কারণ। কার্য-কারণ ও এর ধারাবাহিকতা একটি প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে সারা বিশ্বজগতে ব্যপ্ত রয়েছে। প্রত্যেকটি কারণ, যা প্রাথমিক নয় তা অন্য কারণ থেকে উদ্ভূত এবং এই অন্য কারণটিও অপর আরেকটি কারণ থেকে উদ্ভূত। এইরূপভাবে এক কারণের পর অন্য কারণের এক অনন্ত শৃঙ্খলে সব কিছুই চলছে।

৪৯। আর তিনিই ধনী করেন এবং ধনভান্ডার^{২৮৮৯-ক} দান করেন।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝

৫০। আর তিনিই লুদ্ধক (তারকার) প্রভু^{২৮৯০}।

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعُرَىٰ ۝

৫১। আর প্রথম ‘আদ’ (জাতিকে)^{২৮৯১} তিনিই ধ্বংস করেছিলেন

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝

৫২। এবং ‘সামূদ’ (জাতিকেও ধ্বংস করেছিলেন)। আর তিনি (তাদের) কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

وَنُودًا قَوْمًا آتَيْتُ ۝

৫৩। আর (তিনি) তাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছিলেন)। নিশ্চয় তারাই সবচেয়ে বেশি যালেম ও বিদ্রোহপরায়ণ ছিল।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَ ۝

★ ৫৪। আর তিনি (লুতের জাতির) বিধ্বস্ত জনপদগুলোকেও উলটিয়ে ফেলেছিলেন।

وَالْمُتَفَكِّكَ أَهْوَىٰ ۝

★ ৫৫। অতএব তাদের তা ঢেকে ফেলেছিল, যা (এমতাবস্থায়) ঢেকে ফেলে^{২৮৯২}।

فَعَشَهَا مَا عَشَىٰ ۝

৫৬। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে বিতর্ক করবে^{২৮৯৩}?

فَيَأْتِي آلَاءَ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্কবাণীসমূহের ন্যায় এও এক সতর্কবাণী।*

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝

২৮৮৯-ক। ‘আগনাল্লাহ্ ফুলানান’ আল্লাহ্ অমুককে ধনী করেছেন এবং এত বেশী দিয়েছেন যে সে পরিতৃপ্ত হয়েছে (লেইন)।

২৮৯০। ‘লুদ্ধক তারকার প্রভু’। পৌত্তলিক আরবরা ‘সিরিউস’ (লুদ্ধক) নামক দেবতাকে ধন-দারিদ্র ও ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পূজা করতো।

২৮৯১। তওহীদের স্বপক্ষে বিবেকের যুক্তি ও মানুষের অকিঞ্চিৎকর জন্মলগ্নের বিষয় অবতারণা করে এখন সূরাটি এই আয়াত থেকে তওহীদের স্বপক্ষে ইতিহাসের ঘটনাবলীর অবতারণা করছে।

২৮৯২। ‘মা’ উপপদটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; ‘মা গাশ্শা’ যা বা যিনি আচ্ছাদিত করেন। এখানে অর্থ হচ্ছে, মহা শাস্তি তাদেরকে আচ্ছাদিত করলো।

২৮৯৩। মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে এত অধিক সংখ্যক সুস্পষ্ট ও অকাট্য যুক্তি ও নিদর্শনাবলী দেখার পরও অবিশ্বাসীরা সত্য গ্রহণে অগ্রসর হয় না। এই আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, তারা আর কত কাল সত্যকে অগ্রাহ্য করে অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকবে?

★[‘নাযীর’ (সতর্ককারী) ‘ইনযার’ (সতর্কবাণী) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল মুনজিদ দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৮। (এ জাতিরও) প্রতিশ্রুত মুহূর্ত^{২৮৯৪} ঘনিষে এসেছে।

أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ۝

৫৯। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা কেউ টলাতে পারবে না।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

৬০। তবে কি তোমরা এ কথায় অবাক হচ্ছ?

أَفَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝

৬১। আর তোমরা হাসছ! তোমরা কাঁদছ না (কেন)?

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

৬২। আর তোমরা তো উদাসীন।

وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۝

৬৩। অতএব আল্লাহর সমীপে সিজদাবনত হও এবং (তাঁর)
ক'ইবাদত কর^{২৮৯৫}।

فَاَسْجُدْ وَابْتَغِ ۝

দেখুন : ক. ৭ঃ২০৬, ২২ঃ৭৮, ৪১ঃ৩৮, ৯৬ঃ২০

২৮৯৪। 'আজেফা' অর্থ বিচার-দিবস, পুনরুত্থান, সন্নিহিত ঘটনা, মৃত্যু (লেইন)। নবুওয়াতের প্রথমদিকেই পঞ্চম বৎসরে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন শত্রুর হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ভীতি-প্রদর্শন ও অমানুষিক অত্যাচারের কারণে ইসলামের ভাগ্যকাশ দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল। ঐ সময়ে এই সূরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে কুরায়শদের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সূরাটিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আরো অধিক জোরের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে (৫৪ঃ৪৬)।

২৮৯৫। মহানবী(সাঃ) যখন এই সূরাটি তেলাওয়াত করে উপস্থিত মুমিন-কাফির সকলকে শুনিয়ে শেষ করলেন এবং অনুসারীবৃন্দসহ নিজে সিজদায় পড়লেন তখন কাফিররাও তেলাওয়াতের ভাব-গাষ্ঠীর্থে এবং আল্লাহ তাআলার মহিমা-কীর্তন শুনে অভিভূত হয়ে সিজদায় পড়েছিল। এইরূপ করা তাদের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা তারাও আল্লাহ তাআলাকে স্রষ্টা ও সর্বোচ্চ প্রভু বলে মনে করতো এবং তাদের উপাস্য দেবতাগুলোকে সর্বোচ্চ প্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম বা যোজক হিসাবে জ্ঞান করতো (১০ঃ১৯)। এই যুক্তিসঙ্গত ঘটনাকে ২০,২১,২২ নং আয়াতের সাথে জড়িয়ে কল্পনাবিলাসীদের দ্বারা মিথ্যা কাহিনীর জাল বোনা হয়েছিল। এর মাঝে দুর্নাম রটনাকারীরা মহানবী (সাঃ) এর 'বিচ্যুতির' সন্ধান পেয়েছে বলে মনে করে থাকে। কিন্তু এই সকল মিথ্যা রটনাকারীরা যে আসলেই বিভ্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।